ধলেশ্বরী নদী তীরে

পূরবী বসু

বহুকাল আগে এক স্কুল বালকের কাছে গ্রাম ও শহরের প্রধান পার্থক্য কী জানতে চাওয়া হলে সে বলেছিল, শহরের বাড়ি-ঘরগুলো খুব কাছাকাছি, আর গ্রামে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব অনেকটাই। তখনকার দিনে এটা একটা বড় পার্থক্য ছিল সন্দেহ নেই, যা আজো সত্য গ্রামে-শহরে। তবে আমরা যারা অন্তত অর্ধ শতাব্দী আগে জন্মেছি এ দেশে তারা সবাই জানি, আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে, বাড়ি থেকে বাড়ির দূরত্ব ছাড়াও দৃশ্যত প্রকট আরো অনেক ব্যবধানই ছিল গ্রাম ও শহরের মধ্যে। বিশেষ করে প্রাত্যহিক জীবনে প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বা উপকরণে, রাস্তাঘাট, যানবাহন, পোশাক-আশাকে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে, বিশেষ করে দূরপাল্লার সড়ক, ফেরি ও মোবাইল ফোনের কল্যাণে, বিদ্যুতের মহিমায় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির প্রসারে, আর বহির্বিশ্বে গ্রামীণ তরুণ সম্প্রদায়ের কিছু সদস্যের নিয়মিত যাতায়াতে ও কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগে গ্রাম-শহরের পার্থক্য আজ আর তেমন তীব্র হয়ে চোখে পড়ে না।

আমার গল্প পড়ে কাউকে কাউকে মন্তব্য করতে শুনেছি অনায়াসেই নাকি বোঝা যায় আমি গ্রামের মেয়ে। গ্রামেই বেড়ে উঠেছি। মুন্সীগঞ্জ শহর, যেখানে বেড়ে ওঠা, তা এমনকি সেই পঞ্চাশ বা ষাটের দশকেও ঠিক গ্রাম ছিল না। তবে গ্রামের সঙ্গে, অন্তত একটি গ্রামের পরিচয় রয়েছে। সেকথা পরে বলি। মুন্সীগঞ্জ মফস্বল শহর। চারদিকে নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন, একাকী দ্বীপের মতো, ছিমছাম ছোট্ট এক শহর। এক রাস্তার এই শহরের প্রধান পাকা রাস্তাটি শুরু হয়েছিল নদীর ধারে গুদারা ঘাট থেকে। চলে গিয়েছিল শহরের শেষ মাথা পর্যন্ত। এই রাস্তার ওপরেই সব দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত। রাস্তার দু'পাশ দিয়ে ভেতরের দিতে গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট আবাসিক এলাকা। এগুলো বিভিন্ন পাড়া নামে পরিচিত যেমন-জমিদার পাড়া, মালপাড়া, গোয়ালপাড়া, লক্ষ্মী নারায়ণপাড়া, মাঠপাড়া, শ্রীপল্লী, বাগমাদুদালী খাল পার, কোটগাঁও ইত্যাদি। মুন্সীগঞ্জ শহরে তখন কোন গাড়ি বা বাস চলাচল করত না। ট্রেনের তো প্রশ্নই আসে না। শুধু ছিল রিকশা ও সাইকেল। মনে পড়ে, শহরের একমাত্র মোটরযান ছিল তখন লাল রঙের ফায়ার ব্রিগেডের বহু পুরনো এক ট্রাক। দু'বছর চার বছরে একবার যখন বেরুত সেই লাল গাড়ি, ঘন্টা বাজিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে যখন চলে যেত, এর সঙ্গে কারো কোন দুর্ভাগ্য বা অশুভ ঘটনার যে যোগাযোগ থাকতে পারে, এ কথা তখন বাচ্চাদের মনেই আসত না। আমরা প্রচণ্ড আমোদ আর উত্তেজনায় ছুটে যেতাম রাস্তায় শুধু এক নজর চলতি এক গাড়ি দেখার জন্য। আমাদের শহরে বহুকাল পর্যন্ত কোন বিদ্যুৎ ছিল না। স্থানীয় বরফের কল থেকে সন্ধ্যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য ডিসি ইলেকট্রিসিটি বিতরণ করার যখন ব্যবস্থা করা হল, সর্বপ্রথম যেসব মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি এসেছিল, তাদের মধ্যে আমাদের পরিবার ছিল অন্যতম। দীর্ঘকাল ধরে এ অঞ্চলে আমাদের বসবাস ও ডাক্তার হিসেবে বাবার পরিচিতির সুবাদেই হয়তো এটা জুটেছিল। মনে পড়ে, মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য বাসায় বিদ্যুৎ আসার পর পরই ঢাকা গিয়ে একদিন বেশ বড়সড় চৌকো সাইজের একটা মারফি রেডিও কিনে এনেছিলেন। সেই রেডিওর সামনে গোল হয়ে বসে আমরা খবর শুনতাম। গান শেখবারও চেষ্টা করতাম। পঙ্কজ মল্লিকের নির্দেশনায় রেডিওর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। তার সার্বক্ষণিকভাবে যখন বিদ্যুৎ থাকতে শুরু করল আমাদের সবার প্রিয় ছিল অনুরোধের আসর ষাটের দশকের শুরুতে সেই সময় হেমন্ত, শ্যামল, মানবেন্দ্র, সতীনাথ, তরুণ, ধনঞ্জয়, মান্না, সন্ধ্যা, লতা, প্রতিমা, আল্পনা, গীতা, উৎপলা আরও অনেক শিল্পী আমাদের মোহগ্রস্ত করে রাখতেন তাদের অনবদ্য সুরের লালিত্যে। অনুরোধের আসরের দিন ভোর থেকেই জল্পনা-কল্পনা চলত সেদিন কোন কোন প্রিয় গান বাজানো হবে। পরস্পরের সঙ্গে বাজিও ধরতাম এই নিয়ে। আমার ঠাকুমা, যিনি প্রযুক্তির ধার ধারতেনা মোটেই, মাঝে মাঝেই তার নিজস্ব অনুরোধ নিয়ে আসতেন আমাদের কাছে। সন্ধ্যার 'মধুমালতি ডাকে আয়' গানটা যেন তক্ষুনি বাজানো হয় ওই যন্ত্রে অর্থাৎ রেডিওতে। আমরাও দুষ্টুমী করে ক্ষেপাতাম তাকে এই বলে, অমুক সময় অনুরোধের আসরে বাজাব। তখন শুনবে। ঠাকুমা যিনি প্রায়ই কুপি নিয়ে আসতেন। ইলেকট্রিক লাইট বাল্ব থেকে সেটা জ্বালিয়ে নেয়ার জন্য। মনে পড়ে, পূজোর ঠিক আগে আগে মহালয়ার দিন ভোররাতে অনেক প্রতিবেশী ভিড় করত আমাদের

বারান্দায় রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ভরাট কণ্ঠে মহালয়া শোনার জন্য। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আধো আলোয় অন্ধকারে মাথায় চাদর চাপা দিয়ে প্রতিবেশীরা এসে জড়ো হতো আমাদের বাইরের বারান্দায়। রেডিওর শব্দ যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দেয়া হতো যাতে সবাই ভালোমতো শুনতে পায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অনবদ্য কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ।

মহালয়া শোনার পর বায়োজ্যেষ্ঠরা একসঙ্গে প্রাতঃকালীন ভ্রমণে ভেরুতেন নদীর ধারে। নদীর ধাঁরে হাটতে যাওয়া, হয় সকালে অথবা বিকেলে, একটা নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চার অংশ ছিল তখন প্রায় প্রতি পরিবারেই।

মুন্সীগঞ্জের সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছিল বেশ জমজমাট। হরগঙ্গা কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন নাট্যকার আযিমুদ্দিন আহমেদ (আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদের পিতা)। আব্দুল্লাহ্ আবু সায়ীদ ও তার সহোদর আবদুল্লাহ্ আল মামুন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) ও কলেজে পড়েছিলেন কিছুকাল। আব্দুল্লাহ্ আল মামুন ভালো তবলা বাজাতেন কলেজে নিয়মিত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। আযিমুদ্দিন আহমেদ রচিত মহওয়া মা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল মনে পড়ে। মোতাহার হোসেন বলে আমাদের প্রতিবেশী এক কলেজ ছাত্র তখন উঠতি নায়ক মঞ্চে। কিন্তু নারী চরিত্রে কলেজের মেয়েরা তখন অভিনয় করত না। নারী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য পেশাদার শিল্পীদের নিয়ে আসা হতো ঢাকা থেকে। তারা একদিন আসতেন রিহের্সেলে অন্যদিন ঠিক নাটকের দিনে। ঢাকা থেকে সম্মানী দিয়ে শিল্পী এনে নাটক করা যেহেতু ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল, চেষ্টা করা হতো, নারী চরিত্র-বিবর্জিত বা বিরল নারী চরিত্রের নাটক মঞ্চায়ন করার। কলেজের নাটকে মেয়েরা অংশগ্রহণ না করলেও স্থানীয় পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী যখন জগদ্ধাত্রী বাড়ির বিশাল মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করত, তখন নারী চরিত্রে সাধারণত নারীদেরই অভিনয় করতে দেখা গেছে। মালখানগর থেকে বিচিত্রা বসু ও তার ছোট বোন (নামটা মনে নেই) একবার নাটক করতে এসেছিল মনে পড়ে। বড় সুন্দর ছিল তারা দুজনেই দেখতে। রাতে নাটক দেখার পর মেকআপ ছাড়া তাদের আর একবার স্বচক্ষে দেখব বলে শ্রীপল্লীর খগেন মিত্রের বাসায় পরের দিন সকালবেলা আমি ও ছোড়াদি উপস্থিত হয়েছিলাম মনে পড়ে। বিচিত্রা বসু ও তার সহোদরা সেই বাড়িতেই এসে উঠেছিল। খগেন মিত্রের খগেন মিত্রের যমজ কন্যা অরুণা ও বরুনার কাছে পরে শুনেছিলাম, তারা ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মেকআপ ছাড়াও এই দুই অভিনেত্রী অত্যন্ত সদর্শনা ছিল মনে পড়ে মালখানগরের বিচিত্রা বসু বা তার ভগিনী ছাড়াও স্থানীয় শিল্পী ছায়ারানী দত্তও নিয়মিত অভিনয় করত। একবার অবশ্য গোঁফ কেটে, গলা সরু করে অজিত চৌধুরী অর্থাৎ ছক্কু মোক্তারকেও মেয়ে সেজে অভিনয় করতে দেখেছি। অজিত চৌধুরী ছিলেন তখনকার দিনের ডাকসাঁইটে উকিল চিন্তাহরণ চৌধুরীর ছোট ভাই। তাদের বাড়িটা ছিল থানায় পুকুরের উল্টো পাড়ে জগদ্ধাত্রী বাড়ির পেছন দিকটায়। জগদ্ধাত্রী বাড়িতে ছিল বিশাল সেই বকুল ফুল গাছ। মাটিতে ঝরে পড়া বকুল তুলে মালা গাঁথার জন্য ভোরবেলা কার আগে কে সেখানে পৌঁছাতে পারে এই নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো আমাদের মধ্যে। অজিত চৌধুরী ছাড়াও তখন মঞ্চে বিখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন। জিতেন্দ্র চক্রবর্তী অর্থাৎ লাবড়া চক্রবর্তী (মোক্তার)।

মুন্সীগঞ্জের আবদুল হাই তখন রেডিওতে ও পরে টেলিভিশনে নিয়মিত গান গাইতেন। স্থানীয় অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনে সুপরিচিত ছিলেন বীণা ব্যানার্জি। আবদুল সামাদ (পরে কৌতুকাভিনেতা টেলিসামাদ বলে পরিচিত), যতদূর মনে পড়ে আবদুল হাইয়ের ছোট ভাই তখন সবে নাটক করতে শুরু করেছেন। রঙ্গলাল সেন বলে এক পরিচিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমাদের পাড়ায়, যিনি খুব ভালো বক্তৃতা করতে পারতেন, অত্যন্ত ভালো আবৃত্তিও করতেন। আজও মনে পড়ে, ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে স্বভাবসুলভ তার বা বহুখানা ভাজ করে পেছনে পিঠের দিকে বিশেষ এক পরিচিত ভঙ্গিতে রেখে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তিনি স্বাচ্ছিন্দে। স্বচ্ছন্দে মনে হতো বটে-তবে সারাক্ষণ পেছনে এক আঙ্গুলের নখ দিয়ে আরেক আঙ্গুল খুঁটে খুঁটে প্রায় রক্ত ঝরিয়ে ফেলার উপক্রম করতেন তিনি। লোকে বলত এটা তার মুদ্রাদোষ অথবা নার্ভাসনেস। রঙ্গলাল সেনের 'আফ্রিকা জীবনানন্দের বনলতা ' ও নজরুলের বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করতে শিখেছিলাম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা জন্য। সঠিক উচ্চারণ ও কণ্ঠের ওঠানামা শেখা এতটা যে কষ্টকর হবে আগে বুঝিনি। হরগঙ্গা কলেজের কলেজের লাইব্রেরিতে তখন পরিমল ভট্টচার্য অর্থাৎ 'কালুদা' কাজ করতেন। তার উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় বই পড়ার আগ্রহ বেড়েছিল অনেকেরই। তিনি বেছে বেছে ভালো বই এনে দিতেন আমাদের সবাইকে। মুন্সীগঞ্জে তখন আরো ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় সাংবাদিক সফি ভাই (সফিউদ্দিন আহমেদ যিনি সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি অথবা জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন এক সময়)। পায়ে হেঁটে পুরো মহকুমা চষে বেড়াতেন তিনি।

মন্মথ মুখোপাধ্যায় (মনাবাবু) বলে আমাদের পাড়াতেই এক মধ্যবয়সী সুদর্শন মোক্তা ছিলেন। শীতকালে থানার পাশে তাদের বাড়ি সংলগ্ন বিরাট মাঠে দু'পাশে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিয়ে হাফ হাতা সাদা গেঞ্জি ও সর্টস পরে মনাবাবু ও তার বন্ধুদের অনেক রাত পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখেছি। মনাবাবুর সঙ্গে এ খেলায় কেউ পেরে উঠত না তিনি গান গাইতেন। তবলাও বাজাতেন। একাত্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এই মনাবাবুকে মুন্সীগঞ্জেই। ভালো খেলোয়াড় ও সাতারু হিসেবে মহিউদ্দিন আহমেদ (পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী ও আওয়ামী লীগ নেতা) বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তার শারীরিক গড়ন ও সামথ্যের জন্য তাকে মিঃ মুন্সীগঞ্জ উপাধি দেয়া হয়েছিল। মনে পড়ে , চৌষট্টির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি আমার বাবাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন 'কাকাবাবু আমি বেঁচে থাকতে আপনাদের পরিবারের ওপর কেউ হাত তুলতে পারবে না।'

রাজনীতির অঙ্গনও তখন অত্যন্ত মুখর ছিল মুন্সীগঞ্জে। সবচেয়ে পরিচিত ও বিখ্যাত ছিলেন বিক্রমপুরী। ছোটখাটো চেহারার রোগা পাতলা এই মানুষটি শেরেয়োনি পরে গুটগুট করে পুরো মুন্সীগঞ্জ শহর ঘুরে বেড়াতেন। পরের দিকে অবশ্য তার চলাফেরা সীমিত হয়ে এসেছিল এবং তার হাতদুটো সর্বক্ষণ ভীষণভাবে কাঁপত, বিশেষ করে যখন কিছু লেখার চেষ্টা করতেন তিনি। একবার মুন্সীগঞ্জের পৌরসভার নির্বাচনে আমাদের পরিবারের তিন ভোটার অর্থাৎ তিন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে প্রচণ্ড মতানৈক্য দেখা দেয়। আমার মা ও ঠাকুমা একদিকে-জিতেন্দ্র (লাবড়া) চক্রবর্তীর পক্ষে। ওদিকে বাবা একা, কাদের ডাক্তারের পক্ষে। বাবা ও কাদের ডাক্তার বহুকালের বন্ধু। তারা পরস্পরের বাড়িতে চিকিৎসা করতেন। জিতেন্দ্র চক্রবর্তীর নির্বাচনী প্রতীক ছিল হাঁস। মনে আছে পাতলা সাদা কাগজ আর আঠা দিয়ে কমলা ঠোটের বিশাল এক হাঁস বানিয়ে রাস্তা দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে যেত তারা। কাদের ডাক্তারের প্রতীক যতদূর মনে পড়ে নৌকা ছিল। যেদিন বিকেলে কাদের ডাক্তার নির্বাচনে জিতলেন এবং শোনা গেল বিজয় মিছিল নিয়ে তিন বড় রাস্তা ধরে এদিকেই আসছেন। তখনো বাসায় দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি। কাদের ডাক্তার জিতেছেন এবং আসছেন। এদিকে শুনে বাবা লাফ দিয়ে খাট থেকে উঠেই ছুটে গেলেন থানার পাশে বড় রাস্তার ধারে। ঘরে লুঙ্গি পরলেও বাবা বাইরে সব সময়েই ধুতিপঞ্জাবি পরতেন। বন্ধুর বিজয়ের আনন্দের আতিশয্যে লুঙ্গি পরেই সেদিন বড় রাস্তায় চলে আসেন। আর মিছিলের অগ্রভাগে দাঁড়ানো কাদের ডাক্তারও রাস্তার পাশে বাবাকে দেখে ছুটে এসে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেন। খুশিতে উস্বেলিত বাবাও বন্ধুর পিঠে কাছে আর গোপন থেকে না বাবা কাকে ভোট দিয়েছেন নির্বাচনে। এর জন্য মুন্সীগঞ্জের হিন্দুপ্রধান এলিট গ্রুপের কাছে বাবাকে কম কথা শুনতে হয়নি। এই কাদের ডাক্তারের বড় পুত্রই বাংলাদেশ টেলিভিশন ও স্বাধীন বাংলা বেতারের সুপরিচিত সংবাদ পাঠক বাবুল আখতার, যাকে বছর দুয়েক বড় অসময়ে হারিয়েছি আমরা। একটা কথা আমি বহুবার ভাবার ও বোঝার চেষ্টা করেছি। মুন্সীগঞ্জের মতো ছোট্ট শহরে এত বেশি উকিল, মোক্তার, মুহুরি ও পেশকার কেন ছিল তখন। পরে বুঝেছি চারদিকে গ্রাম ও চর দিয়ে পরিবেষ্টিত এই শহরে জমিজমা দখল ও মালিখানা সংক্রান্ত মামলা করতে বহু লোক আসত চারপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। জমি বা চর দখল করা নিয়ে মারামারি, খুনোখুনির বিচিত্র ধরনের সংবাদ পেতাম আমরা খবরের কাগজে। মুন্সীগঞ্জের থানাটি আমাদের বাসার খুব কাছে হওয়ায় একবার একটি বড় বালতিতে খুনই পর্যন্ত আস্ত একখানা খণ্ডিত হাত স্বচক্ষে দেখেছিলাম। চর দখলের দণ্ড। মুন্সীগঞ্জ শহরের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া প্রধান সড়কের সমান্তরালভাবে একটানা বয়ে গিয়েছিল লম্বা এক খাল যার অস্তিত্ব আজ আর নেই। খাল ভরাট করার পর মাত্র একবারই গিয়েছিলাম সেই শহরে। সম্পূর্ণ বালু চাপা দেয়া সেই খালের দিকে তাকিয়ে আমার বারবার মনে হয়েছিল, এ যেন আমারই দীর্ঘ কবর। তখন শহরের ঠিক মাঝখানে, প্রাণকেন্দ্রে এই খালের উপস্থিতি শহরটিকে মোহনীয় ও বৈশিষ্ট্যময় করে রেখেছিল, কোন সন্দেহ নেই। খালের দু'পাশের জনবসতির মধ্যে যোগাযোগের জন্য মাঝে মাঝে পাতা ছিল চওড়া পুল। শহরের দুই প্রান্তে নদীর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া এই খাল শহরটিকে রক্ষাও করেছিল বিপুলভাবে। জলপথে চলাচলেও যথেষ্ট সাহায্য করত এই পথেই আমার যোগাযোগ হয়েছিল প্রকৃত এক গ্রামের সঙ্গে, হলদিয়া যার নাম। মনে পড়ে, নদী পথ পার হয়ে এই খাল বেয়েই থানার সামনে রাস্তার ওপাশে, এসে থামত আবার বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা বিরাট ছৈশ্রেলা নৌকো। আমাদের বাসাটা ছিল থানা থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। যিনি যখন নায়র আসত, প্রধানত বর্ষাকালেই, তার অভিজাত শ্বশুরালয় ঘরের বউকে লঞ্চ বা স্টিমারে করে পাঠাত না । দিদির শ্বশুরবাড়ি হলদিয়া, মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্য এক প্রান্তে- লৌহজংয়ের কাছে। ওদের বৈঠকখানা অর্থাৎ কাঠের সেই প্রকাণ্ড দোতলা ঘরের পেছনে যে পুকুর, সেখান থেকেই খাবারদাবার মাঝিমল্লা নিয়ে রওনা হতো দিদি বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে। নৌকোটি এসে যখন থামত মুন্সীগঞ্জ থানার ওপাশে খাল পাড়ে, আমরা ছোটরা ভিড় করে দাঁড়াতাম সেখানে। যেকদিন দিদি থাকত আমাদের বাড়িতে মাঝিরা নৌকোতেই ঘুমুত। শুধু খাবার খেতে আমাদের বাসায়

আসত তারা, অথবা এসে খাবার নিয়ে চলে যেত নৌকোয়। মনে পড়ে, একবার দিদির সঙ্গে বর্ষাকালে নৌকো করে ওর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম। সেই কাকভোরে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম দিদির বাড়ি,অথচ দুটি জায়গাই একই বহুকুমার রাস্তায় পড়েছিল তালতলা, তারপাশে দিঘলী আরও কত গ্রাম। একটা দৃশ্য এখনো চোখে জ্বল জ্বল করে ভাসে। স্বচ্ছ জলের ওপর দিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে ছইঅলা নৌকা। মাঝিরা কখনো কখনো লগি ব্যবহার করছে নৌকো চালাতে। আমি বসে আছি নৌকোর সামনের দিকে-ছইয়ের বাইরে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি টলটলে জলের নিচে লম্বা লম্বা সবুজ ঘাস-আর লতাগুলো। বুঝতে পারছিলাম, রাস্তা সংক্ষিপ্ত করার জন্যই নদী ছেড়ে এই পথে চলেছে নৌকো। যেতে যেতে কাঠের নৌকোর তলাতে জলের নিচে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘাস ও জঙ্গলের ধাক্কায় একটানা খসখস শব্দ হচ্ছিল, আজও যেন সেই আওয়াজ কানে বাজে। আমার বড়দির বিয়ে হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে। সবকথা মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, ওদের হাতে পাম্প করা গ্রামোফোনে তখন একটানা বেজে চলত সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'কে তুমি আমরে ডাক' গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু। অগ্নিপরীক্ষা ও সুচিত্রা উত্তমের তখন মারমার কাটকাট বাজার।

সেই একবার নৌকো করে দিদির বাড়িতে যাওয়া ছাড়াও দু'তিনবার স্টিমার বা লঞ্চে চড়ে সেখানে গেছি। মুন্সিগঞ্জ থেকে চাঁদপুর হয়ে লৌহজংয়ে লঞ্চ পৌঁছাতে সারাদিন লেগে যেত। খুব সম্ভবত গোয়ালন্দের স্টিমারে করে যেতাম আমরা। একবার মনে আছে, ফেরার পথে চাঁদপুরের কাছে পদ্মা-মেঘনার সংযোগস্থলে বিশাল এক ঝড়ের মুখে পড়েছিল আমাদের স্টিমার। ঝড়ের ভোড়ে একদিকে কিছুটা হেলে পড়েছিল জাহাজটি। অনেক রাতে যখন বাড়ি ফিরলাম, দেখি আমাদের গৃহ সংলগ্ন কলা বাগান একটি কলা গাছও আর দাঁড়িয়ে নেই। চারদিকে ওপড়ানো গাছ ভাঙ্গা ডাল, টিনের চাল সব কিছু লণ্ডভণ্ড। বাড়িতে রীতিমতো কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল সে রাতে। আমরা জীবিত ফিরতে পারব ভাবতে পারেনি তারা।

ফলে প্রকৃত গ্রামের সঙ্গে আমার যে পরিচয় বা জানাশোনা তা হলদিয়া ও তার নিকটবর্তী তারপাশা, দিঘলী, মালখানগর গ্রামকে কেন্দ্র করেই। বেশ কয়েক বছর পর, আমার বিয়ের পর, উনসত্তর সালে জ্যোতির (জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত) সঙ্গে লঞ্চে করে ঢাকা গিয়েছিলাম হলদিয়া। প্রায় সারাদিন লেগেছিল সেবারও। যতদুর মনে হয় তালতলায় লঞ্চ বদল করতে হয়েছিল আমাদের। দিদির ছেলে অলক, অশোক, অতীল তখন ছোট স্কুলে পড়ে। টুটুর জন্ম হয়নি তখনো। সেবার এক গভীর রাতে হলদিয়া থেকে আমরা বিশাল এক নৌকো কবে পদ্মা নদীর মাঝখানে গিয়েছিলাম ইলিশ মাছ ধরা দেখতে। চকচকে রূপালী ইলিশ যে ডাঙ্গায় উঠালে এত দ্রুত মরে যায় আগে জানতাম না। সে রাতটি অতি সুন্দর ছিল। আকাশে বড় চাঁদ এলোমেলো হাওয়া। আর ঠিক সেই রাতেই আশ্চর্য রকমভাবে-প্রায় স্বপ্নের মতো মান্নাদে'র ভরাট গলায় সেই অনবধ্য গান, আমি যামিনী, তুমি শশি হে' প্রথম শুনেছিলাম ট্রেনজিষ্টার রেডিওতে। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ছবির সেই বিখ্যাত গান আজও আমার কাছে মান্নাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বলে মনে হয়।

এরপর যখন আবার গেলাম হলদিয়া, লৌহজং ও তার চারপাশ তখন দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে পদ্মার গহ্বরে। আমরা অসহায়ের মতো পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সেই প্রচণ্ড ভাঙন। লোকে বলাবলি করছিল সেদিনই সেখানকার হাসপাতালটি তলিয়ে যাবে স্বগর্ভে। চোখের সামনে অক্ষত হাসপাতালের দালানটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। চারপাশ থেকে লোকজন ঘরের টুকিটাকি মাথায় নিয়ে পার্শ্ববর্তী চরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। পরদিন গিয়েছিলাম যাওয়ার কাছে। পদ্মার ভাঙন চলছে সেখানেও। চোখের সামনে বিশাল বিশাল ভূমিখণ্ড ভেঙে পড়েছিল প্রচণ্ড স্রোতে ও জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কার কাছাকাছি সাময়িকভাবে বাঁশের বেড়া দিয়ে নির্মিত ছোট ছোট খুপরিতে বসবাস করছিল শ্রগুন্তি নদীভাঙ্গা মানুষ। দিদির বাড়িতে সেবার ব্যাটারিচালিত টেলিভিশন দেখেছিলাম মনে পড়ে। তার কিছুদিন পরই বিদ্যুৎ চলে আসে সে গ্রামে।

আরও পরে, এখন থেকে কয়েক বছর আগে, যখন গেলাম হলদিয়া, ঢাকা থেকে গাড়ি করে সেখানে যেতে এক ঘন্টার একটু বেশি সময় লাগল কেবল। যাওয়ার পথে দু'পাশে সুদৃশ্য বৃক্ষরাজির মাঝখান দিয়ে হাইওয়ে ধরে আমরা যখন দ্রুত এগুচ্ছিলাম, আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না সারাদিনের পথ সত্যি সত্যি মাত্র এক ঘন্টায় পার হয়ে যার আমরা। কিন্তু হলদিয়া বাজার থেকে আমাদের পুত্রকন্যার জন্য কয়েক বোতল কোকাকোলা আর পটেটো চিপসের প্যাকেট কিনে অনিল স্তাইবাবু যখন আমাদের গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন, বুঝলেন সত্যি সত্যিই আমরা হলদিয়া পৌঁছে গেছি। তবে হলদিয়া এখনো ঠিক গ্রাম রয়েছে কিনা বলতে পারি না। যেমন পারি না বলতে মুন্সীগঞ্জ সত্যি

সত্যিই সেই অর্থে একটি শহর ছিল কিনা অন্তত পঞ্চাশ ষাটের দশকে। তবে শুনেছি, ধলেশ্বরীর বুকে আমাদের আজন্ম লালিত স্বপ্নের সেই সেতু অবশেষে নির্মিত হয়েছে যা নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন মুন্সীগঞ্জের অবশেষে বাকি পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হবে। এ সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দের।

মুন্সীগঞ্জ.কম